মনস্বী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(সমাজ ভাবনা)

শান্তিরাম ঘোষ

প্রেম রসায়নে, ওগো সর্বজনপ্রিয়
করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়। (রবীন্দ্রনাথ)

১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট খুলনা জেলার (বর্তমান বাংলাদেশে) রাড়ুলি গ্রামে প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিশচন্দ্র, মাতা ভুবনমোহিনী। ৫ ভাই ও দু বোন। প্রফুল্লচন্দ্রের ডাক নাম 'ফুলু', 'ফুলু'র স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। কিন্তু ভারি দুরন্ত ছিলেন। তাঁর দৌরাত্ম্যে পাড়া-পড়শীরা হতো অস্থির। বুদ্ধি খাটিয়ে নূতন নূতন উৎপাত করে লোককে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। নিত্য অভিযোগ শুনতে শুনতে পিতা ক্লান্ত হয়ে পড়তেন কিন্তু পড়াশোনায় 'ফুলু' ছিলেন চৌখশ। পাঠ্যবই ছাড়া অতিরিক্ত গ্রন্থ পড়তে ভালোবাসতেন। সবচেয়ে ভালো লাগত ইতিহাস ও চরিতকথা। রাত ৩/৪টে পর্যন্ত আলো জ্বেলে পড়তে ভালোবাসতেন। নিঝুম রাতে আলো জ্বেলে একা বসে একমনে পড়ে চলেছেন, যেন তাপস-বালকের ভোরের তপস্যা।

পাঠশালার পাঠ শেষ হলে ৯ বছৰ বয়সে কলকাতায় হেয়ারস্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের পাঠ শেষ করে 'মেট্রোপলিটান কলেজে' (বিদ্যাসাগর) ভর্তি হন। এ সময় এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন স্বদেশী যুগের 'মুকুটহীন রাজা' রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজের পাঠ শেষ করে গিলখ্রাইস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্কলারশিপ পান এবং তার উপর ভিত্তি করে বিলাতে পাঁচ বছর 'এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে' পাঠ শেষ করে দেশে ফেরেন D. Sc. উপাধি লাভ করে। দেশে ফিরে অনেক চেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক পদ লাভ করলেন। কিন্তু চাকরি হলো, প্রাদেশিক অর্থাৎ 'দ্বিতীয় শ্রেণির'। 'প্রথম শ্রেণির' অধ্যাপক পদ সাহেবদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও এজন্য ৩ বৎসর বিনা বেতনে চাকরি করেছিলেন।

সেকালে লোক বিলাত গেলেই সাহেব হয়ে যেতো। প্রফুল্লচন্দ্র হলেন খাঁটি বাঙালি তার ওপর পোশাকের পারিপাট্যের দিকেও দৃষ্টি নেই মাথার চুলে কস্মিনকালে চিরুনি বা বুরুশ চলে বলে মনে হয় না। মুখে তখন থেকেই দাড়ি। চাপরাশি ও তাঁর পোশাক একই রকম অর্থাৎ একই থান কেটে বানানো। পড়াশোনায় তিনি নিবিষ্ট থাকতেন বেশি। এ সময় কেউ বিরক্ত করলে রুষ্ট হতেন। তাঁর সম্পর্কে এক নাতি ঐ পড়ার সময় বিরক্ত

করলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। নাতিও তখন 'কুমারসম্ভব' (কালিদাস) থেকে নতজানু সশরাসনপৃষ্ঠ মদনের অনুসরণে বলেন—''কুর্য্যাৎহরস্যাপি পিনাকপানে ধৈর্য্য চ্যুতিং কে মম ধন্বিনোহন্যে?'' (পিনাকপাপি হরের ধ্যান আমি ভিন্ন অন্য ধুনধারীকে ভাঙ্গিতে পারে?) নাতির 'কুমারসম্ভব' পড়া সার্থক হয়েছে বলে তিনি মনে করেছিলেন। এই নাতিকেও তিনি ব্যঙ্গ করতে ছাড়তেন না। বলতেন, 'তুই একজন N. P. P. (না পড়ে পণ্ডিত)

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণের সময়ে 'বিদায় সভায় তিনি বলেছিলেন, ''আমি কখন পার্থিব ধনসম্পত্তি খুব সাবধানে রাখিনি। আমার ছাত্ররাই আমার রত্ন। ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ডাঃ প্রফুল্লকুমার মিত্র, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ রসিক লাল দত্ত, ডাঃ বিমানবিহারী দে, সত্যেন বোস প্রমুখ ছাত্র রত্নরা নানা মৌলিক প্রবন্ধে আপন আপন কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন।

৬০ বছর পূর্ণ হলে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পত্র দেন যে, বাকি দিনগুলি বিজ্ঞানমন্দিরের পরীক্ষাগারে কাটিয়ে দিতে চান। এ জন্য পালিত অধ্যাপকের প্রাপ্য মাসিক হাজার্ টাকাও তিনি নেবেন না উপরন্তু উহা যেন বিজ্ঞানমন্দিরের রাসায়নিক বিভাগে ব্যয় হতে পারে—এটা তাঁর ইচ্ছা। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক, তিনি বললেন, আমি বহু হব, সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে; তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, রাসায়নিক, গবেষক, আবিষ্কারক, লেখক, ভাষাবিদ, উদ্যোগপতি, সফল ব্যবসায়ী, সমাজসেবী, সমাজসংস্কার, দেশপ্রেমী, খ্যাতিমান। সর্বোপরি আদ্যন্ত অত্যন্ত সাধারণ, ছাপোষা একজন খাঁটি বাঙালি ছিলেন তিনি। এই বহু হতে গিয়েই তাঁর পথে সম্ভব হল কি যুগান্তকারী আবিষ্কার? কেমিক্যাল সোসাইটি অব লন্ডন-এর প্রেসিডেন্ট হেনরি এডওয়ার্ড আর্মস্ট্রং যিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে মাস্টার অব নাইট্রাইটস' বলেছিলেন তিনি বলেন, 'সত্যি বলতে, রে (প্রফুল্লচন্দ্র) তেমন বড় রসায়ন বিশেষজ্ঞ নন, ... তিনি অনেক দিকে ব্যস্ত, রসায়নের আবিষ্কারগুলি এবং তার পুরোধা পুরুষদের থেকে নিজেকে এত দূরে রেখেছেন যে, এর সমস্যাগুলির ভাবনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতে অথবা এর গোলক ধাঁধায় পুরোপুরি তলিয়ে যেতে পারেননি।' কথাটা আবার অন্যভাবে বলেন, তাঁর ছাত্র প্রিয়দারঞ্জন রায়। তাঁর মতে— 'ভারতে রসায়ন চর্চার উন্নতিতে প্রফুল্লচন্দ্রের আসল অবদান যতটা নয় তাঁর নিজস্ব ফলাফল প্রকাশ, তার চেয়ে ঢের বেশি তরুণ প্রজন্মকে প্রেরণা এবং হাতে খড়ি। এ সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র বলেন, ''যা পেয়েছি তা বিরাট বড়ো সাফল্য বলে মনে হয়নি ... তবে কাজ করে গেছি, আর তার মধ্যেই পেয়েছি সুখ।''

বয়সে রবীন্দ্রনাথ ৩ মাসের বড়ো। দুজনেই 'নাইট' উপাধি পেয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র করেননি, শোনাযায়, প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশী যুগে বহু বিপ্লবীকে বিভিন্নভাবে প্রশ্রয় ও সাহায্য দিতেন—বিদেশী সরকার ঐ খেতাবের জন্যই শ্রীরায়কে

ব্যতিব্যস্ত করেনি। ১৯২১ সালে বারানসীতে 'Hindu College' তৈরি হলে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য শ্রীরায়কে সেখানে আহ্বান করেন এবং তার উত্তরে শ্রীরায় জানালেন—"That Bengal is very much in need of Poor Dr. P. C. Roy and Pandit Madan Mohan Malaviya has all the qualities of Sir Asutosh Mukherjee minus his genius." একসময় বাঙ্গালোরের অদূরে কোলার জেলার স্বর্ণখনি দেখতে যান। সেখানে সোনা গলিয়ে ইটের মতো করে রাখা হয়। খনির সর্বময়কর্তা তাঁকে অভিনন্দিত করেন এবং একখানি ইট নিতে বলেন, যার ওজন ৩০ সের, যেটা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হবে। আচার্য রায় সহাস্য মুখে উত্তর দেন—"আমার নিজের ওজনই ৩০ সেরের কম, তা আমি ঐটা নিয়ে যাই কি করে?" আচার্য রায় নিজেকে ব্যঞ্জনবর্গের ঃ (বিসর্গ) বলতেন অর্থাৎ সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম এমনকি কোঅপারেটিভ সোসাইটি উদ্বোধন তথা সভাপতিত্ব তাঁকে করতে হয়েছে। যেখানেই গেছেন বাঙালি ছেলেদের ব্যবসা করার কথা বলেছেন। চাকরির জন্য হাহাকারে সময় নষ্ট না করে তিনি ব্যবসা করতে বলেছেন।

একবার বিজ্ঞান কলেজে একজন এম এ পাশ ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন—কথায় কথায় তিনি জানালেন নূতন আর একটি বিষয়ে এম এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শুনেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন—"Creator created the Bengalees for pasisng examinations, fulfil His wish." ভদ্রলোক তো একেবারে চুপ। বাঙালি সমাজে মামলাপ্রবণতার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তাই এমনকি আইনকলেজ একেবারে বনধ করে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাই বলে আইনজ্ঞদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না, খ্যাতনামা আইনজ্ঞ রাসবিহারী ঘোষ সম্বন্ধে বলেন—"Had there been no Rashbehari Gosh, There would have been no Bengal chemical today. যখনই অসুবিধা হয়েছে বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য শ্রী ঘোষ টাকা দিয়েছেন। এবং সেটাই হল তাঁর শেয়ার।

বিজ্ঞানের নামে যা সব চলছে তা তাঁর মনঃপূত ছিল না। একদিন সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে সকালবেলা নিম দাঁতন করছেন দেখে গান্ধীজী (সেখানে এসেছিলেন) তাঁকে বললেন—"You are using 'Neem' Stick, but you manufacture tooth powder foom the Bengal chemical." আচার্য রায় সোজাসুজি বললেন—"That is meant for the fools, we manufacture it, otherwise they would use foreign products. একবার কোকনদ কংগ্রেসে খাদি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে ট্রেনে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীকে দেখেই বলে ফেললেন—"Frail, fragile frame." রাজাজীও অমনি বললেন—"Leading to the fourth F-'failure'.

বাংলা দেশের তখন দুর্দিন। বেকার যুবকে বাংলা পরিপূর্ণ। তাই তিনি চাইতেন বাংলার যুবক সম্প্রদায় বিলাসিতায় দিন না কাটিয়ে কর্মঠ, উদ্যমশীল ও স্বাবলম্বী হোক। ১৯২৬ সালে ভবানীপুরে প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে উদ্বোধন সংগীত গাইবার ভার পড়ে বিখ্যাত গায়ক নলিনীকান্ত সরকারের উপর। 'সভা' আরম্ভের দশ মিনিট পরে শ্রী সরকার এলেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে বললেন—"দেরি করে এলি যে?" বিভিন্ন জায়গায় বাস থেমে

থেমে আসার জন্যই তাঁর দেরি একথা জানালে শ্রী রায় বলেন—'বাসের ড্রাইভার কন্ডাক্টর সকলেই কি অবাঙালি? শ্রী সরকার জানালেন সকলেই পাঞ্জাবী। তখন শ্রীরায় বললেন—বাংলা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে অবাঙালিদের হাতে, দেখেছিস? হাওড়ার পুল থেকে কলেজস্ট্রিট পর্যন্ত ডাইনে বাঁয়ে সবটাই বড়বাজার হয়ে গেছে। বাঙালি মরে যাচ্ছে, আর তোরা ভারত স্বাধীন করবার জন্য বোমা-রিভলবার ছুঁড়ছিস।

বাঙালির অন্ন সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা ও সমাজ সমস্যা নিয়ে তাঁর রসায়নের গবেষণার বাইরে গিয়ে নানারকম মূল্যবান চিন্তা করে গেছেন সারাজীবন। তিনি বলেন—বাঙালির বুদ্ধি আছে। অথচ বাঙলার শিক্ষিত সন্তানেরা অন্নচিন্তায় জর্জরিত। সামান্য কেরানিগিরি করে তারা কোনো রকমে দিনপাত করে, না হয় উকিল হয়। এই বৃত্তিতেও বেশি আয় করতে পারে না। তিনি বাঙালি ছেলেদের ব্যবসা করতে বলতেন, 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে আছে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন—''আপনি আচরি ধর্ম অন্যেরে শিখায়।'' তাই তিনিও নিজে সামান্য ৮০০ টাকা মূলধন নিয়ে দেশে পত্তন করলেন, এক ওষুধের কারখানা, ''বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্' নামে। সেই কারখনার এখন কয়েক কোটি টাকার মূলধন নিয়ে ব্যবসা করছে। শ্রীরাজশেখর বসু (পরশুরাম) এই কারখানার ম্যানেজার হয়েছিলেন। একবার তার (রায়) কাছে আগত একটি ছেলেকে বললেন, তোকে ৫০০ টাকা দিলে সেটাকে হাজার দু হাজারে দাঁড় করাতে পারবি? ছেলেটি বলল—'কেন পারবো না?' শ্রী রায় বললেন—'তুই ব্যবসার কিছু জানিস না। ব্যবসা কি মুখের কথা? আগে চাই শিক্ষা, একটা প্রকৃত training, সেই সাধনা না থাকালে কিছুই হবে না।'' বাঙালির মস্তিষ্কও তাহার অপব্যবহার' গ্রন্থে তিনি বলেন—বাঙালি যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য শিক্ষা করে—কিন্তু তারা ব্যবসায়ী বা বণিক হয় না—হয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কেরানি (সেটা মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া-র প্রতিষ্ঠান হতে পারে)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এক সময় বলেছিলেন—'বাঙালির ছেলের লেখাপড়া শেখা যেন বালিশের খোলে তুলো পুরে দেওয়া। কেল ঠাসো আর গাদো।' ছুটি হলে মাস্টার মশাইকে ছেলের পেছনে লেলিয়ে দেবেন বিদ্যে শেখার জন্য অভিভাবকরা—এঁরা হচ্ছেন ''Murderer of boys'' বালকহন্তা, স্কুলের ছুটির পর ছেলের অন্ততঃ দুই বা আড়াই ঘন্টা খেলা চাই। কিন্তু তা নয়, বাড়ি এসেই কেতাব নিয়ে বসো। আবার যে বিষয়ে কাঁচা তার জন্য টিউটর রাখো। ছেলে পড়বে কখন? মার্কিন পণ্ডিত এমার্সন বলেন—''Guardians are benefactors but sometimes they act like the worst malefactors.'' বেশি পড়লেই বিদ্যে হয় না। ১৯৩৭ সাল নাগাদ সদ্য বাগেরহাটে যে কলেজ স্থাপিত হয়েছে তার ছাত্রসংখ্যা কম কেন জানতে চাইলেন শ্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর থেকে। তিনি কোনো সদুত্তর না দেওয়ায় শ্রী রায় বলেন—ওখানে মোহনবাগানের ম্যাচ, সিনেমা, ডাইং ক্লিনিং এসব কিছু আছে? ওখানে কি লেখাপড়া হতে পারে? তাই কলকাতায় বড়ো বড়ে কলেজে ভর্তি হতে হবে আর তেতলা হস্টেলে থাকতে হবে?

ছেলেরা আর গ্রামে ফিরবে না, গ্রামমুখো হবে? শ্রী রায় এখনও পর্যন্ত বেঁচে থাকলে আর কি বলতেন তা অনুমান করা যায়।

সময়ের সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে শ্রী রায় কবি Cowper-এর কবিতাটি আওড়াতেন—'Time and Tide wait for none.' যার বাংলা অনুবাদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—

"নদী আর কালগতি একই সমান,
অস্থির প্রভাবে করে উভয়ে প্রয়াণ।"

শ্রী রায় মনে করেন—মানবজাতির প্রতি বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান হল মহামূল্য সময়। ইংল্যান্ডে সামান্য কেরানী ও শ্রমজীবিগণ পর্যন্ত সময়ের মূল্য বোঝেন। এক মিনিটও হেলায় নষ্ট করেন না। আর আমরা কাজ না করার কৈফিয়ত দিই—সময়েৰ অভাব অথচ গল্পগুজব আড্ডা দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই। আচার্য রায় বলেন—ছাত্রের প্রধান কর্তব্য অধ্যয়ন। আর তপস্যা ব্যতীত আর কিছু নয়। একাগ্রচিত্ততা এই তপস্যায় সিদ্ধি দান করে। কিন্তু এ দেশে ছাত্রদের প্রধান বিপদ গল্প, খেলা (বর্তমানে বোকা বাক্সে খেলা দেখা) আর আড্ডা। একাগ্রতার অভাব। আমরা ঠাকুরঘর আলাদা করি কিন্তু পড়ার ঘর আলাদা করি না। ফলে আমাদের কথাই বেশি চলে—"একে উস্‌খুস্‌ দুয়ে পাঠ, তিনে গন্ডগোল, চারে হাট।' হট্টগোলে সরস্বতী টিকতে পারে না। ফলে পরীক্ষার সময় জাগরণে যায় বিভাবরী (রাত্রি) কোনোরকমে পাস, পরে পুস্তক বিসর্জন হকার চাচার দোকানে।

ইংরেজ কখনো বসে থাকে না। সুযোগ পেলেই পাঠাগার তৈরি করে এবং জনগণ বই নিয়ে পড়তে থকে বিনিময়ে কিছু টাকা জমা দেয় উপরন্তু বই নিয়ে জমা না দেওয়ায় মানসিকতা নেই যেটা আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে দেখে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—জাপানে তাঁর বাসার দাসী তাঁর গীতাঞ্জলির খবর রাখে—আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ-কে অনেকেই জানেন না। যে গীতাঞ্জলির জন্য তার 'নোবেল' পদকপ্রাপ্তি—সেই পদক প্রাপ্তি খবর আমরা তখনও জানি না।

ভারতে জাতিভেদ এক বড়ো সমস্যা। এ জন্য ভারতকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি এবং এখনও করতে হয়। অস্পৃশ্যতা হলো মনুষ্যত্বের অপমান। ঋগ্‌বেদের যুগে জাতিভেদ ছিল না—Caste is not a Vedic institution', জনসাধারণকে নিয়ে জাতি। সেই 'জাতি'র কথা শিবনাথ শাস্ত্রী যখন তামিল দেশ ভ্রমণকালে ছিলেন তখন দেখেন—এক সম্প্রদায়ের লোক দূর থেকে চিৎকার করতে করতে আসে। 'মহাশয় সরে যান, আমি অধম যাচ্ছি।' এতে ব্রাহ্মণদের পবিত্রতা উবে যাবে তাদের ছায়াস্পর্শের জন্য। শুধু তাই নয়, আবার কোনো হতভাগ্যের গলায় ঘন্টা বাঁধা আছে। চলতে গেলেই ঘন্টা বাজে, আর সেই শব্দ শুনে শুচি ব্রাহ্মণ অশুচির আগমন-বার্তা জানতে পেরে ছুটে পালান। শ্রী রায় বলেন—"আমরা বিলাতী বিস্কুট খাব, বরফ দিয়ে সোডা লেমনেড খাব কিন্তু জাতিবিশেষের কেউ যদি হাতে করে এক গ্লাস জল দেয়, অথবা আমাদের চৌকাঠ মাড়ায়,

তাহলে অমনি চিৎকার, জাত গেল, হাঁড়ি ফেল, স্নান কর।' বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলি দেশের শ্রীবৃদ্ধি কাদের নিয়ে—যদি জেলে তাঁতি এদের উন্নতি না হয়।

অল্প পরিসরে শ্রী রায়ের কর্মজীবন মসৃণ করে বলতে চাই—আমাদের দেশের উন্নতির মূলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা, সার্বিক শিক্ষা (ডিগ্রি-সর্বস্ব শিক্ষা নয়) আর প্রকৃত শিক্ষক (শুধুমাত্র ডিগ্রিধারী নয়)। আচার্যের কয়েকটি বাণী যদি মনে রাখি তবে মঙ্গল আমাদের (১) যুবকগণ ফোন করে তারা যেন জগৎ অন্ধকার না দেখেন, এবং ক্ষোভে ও দুঃখে আত্মহত্যা না করে বসেন (২) বিশ্ববিদ্যালয় দ্বার বন্ধ করলে কি টাকা পয়সা বা মনুষ্যত্বের দ্বার বন্ধ হয়? (৩) পরিবর্তনশীল জাগতিক ব্যাপারের সঙ্গে, বুদ্ধি, কৌশল ও প্রাণশক্তির বলে যারা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে, জীবন সংগ্রামে তারাই টিকে যায়। (৪) এখনকার দিনে—জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি'—বলে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আলস্য ত্যাগ কর, উন্নতির জন্য উঠে পড়ে লাগা চাই—ভালো করে খাওয়া চাই-ই (৫) কোনো কোনো বাঙালির ব্যবসায়ে অসাফল্যের দুটি প্রধান কারণ—সততা ও সঙ্কল্পের দৃঢ় অভাব। (৬) অন্য জাতির প্রতি আমার ঘৃণা নেই। ওদের বলি তোমরা ব্যবসার সাথে লেখাপড়া শেখ, আর বাঙালিকে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা করাটাও শেখ।

চর্যাগীতির একটা পদ—'নগর বাহিরে রে ডোম্বি তোহারি কুড়িয়া'—(নগরের বাইরে ডোম্বার কুঁড়ে ঘর)—রাজবাজার বিজ্ঞান কলেজের দোতলায় নির্জনতম কোণে ঘর নং-৩৬, আচার্য পি সি রায় মিউজিয়াম।' কেউ বলে না দিলে বিজ্ঞান কলেজে ঢুকলেও বোঝা অসম্ভব। ১৯১৬ থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত (১৬ই জুন—১৯৪৪) পর্যন্ত এখানেই থেকেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর ব্যবহৃত যাবতীয় জিনিসপত্র এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে; ১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই তার দেহাবসান হয়।

ইংলন্ডের অতি সঙ্কটময় মুহূর্তে কবি Wordsworth কবি Milton-কে স্মরণ করে আকুল আহ্বান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "Oh Milton. Thou shouldnot be living at this hour. England hath need of Thee." আমরাও সমভাবে আচার্যদেরকে বাঙলার দুঃসময়ে বাঙালিদের রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানাই।

রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই স্তুতি করি আজীবন কুমার ও তপস্বীর জীবন—

"হে তপস্বি! ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জনে উত্তিষ্ঠিত! নিবোধত! ডাক শাস্ত্র অভিমানী জনে পাণ্ডিত্যের পাপ তর্ক হতে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যজনে একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম হুতাগ্নি ঘিরিয়া! বারবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে।"

এবার আচার্যের লেখা বইগুলোর নাম করি ঃ History of Hindu chemistry (vol-I+II) life and Experiences of a Bengalee chemist (vol-I+II) Makers of Modern Chemistry, the Discovery of Oxygen. সরল প্রাণি বিজ্ঞান, নব্য

রসায়নী বিদ্যা ও তার উৎপত্তি রাসায়নিক পরিভাষা, বাঙালির মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার ইত্যাদি। এ ছাড়া রসায়নের উপর ১০৭টি গবেষণাধর্মী বিশেষ নিবন্ধ লিখেছিলেন। তৎকালীন ইংরেজী ও বাংলা দৈনিকগুলিতে নিয়মিত তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সামাজিক নিবন্ধ লিখতেন।

আচার্যের ইচ্ছা—সঞ্চয় হলেই খরচ করতে ভালোবাসতেন। ব্যাঙ্কে— ১১১২ টাকা হয়েছে শুনেই তিনি টাকাটা ব্রাহ্মসমাজকে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন (আত্মচরিত)। নজরুলের চরখার গান' আর 'জাতের বজ্জাতি' গানদুটি তাঁর প্রিয় গান ছিল। নারকেল মুড়ি তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল। মুড়িকে স্বদেশী বিস্কুট বলতেন।

আচার্যের বিশ্বাস—'হিরন্ময়ে পপাত্রেন সত্যস্যাপিহিতম মুখম্' সত্যের মুখ হিরন্ময় পাত্র দিয়ে ঢাকা থাকে। সেটা সরালেই তবে সত্যের মুখোমুখি হওয়া যায়। তিনি তা পেয়েছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো সর্বত্যাগী ঋষিতুল্য আচার্য এদেশে কখনও জন্মায়নি, কখনও জন্মাবে না। তাই বলি—

জায়ন্তে চ ময়ন্তে চ মাদৃশ ক্ষুদ্রজনস্য,
অনেক সদৃশ লোকে ন ভূতো, ন ভবিষ্যতি।

(আমাদের মতো অসংখ্য ক্ষুদ্রজন জন্মগ্রহণ করছে তাদের মৃত্যুও হচ্ছে।)

প্রফুল্লচন্দ্র মনে করতেন বিজ্ঞানচর্চা সীমিত মানুষের বিষয় হতে পারে না, সকলেরই এতে মুক্ত অধিকার। তাঁর সার্ধশততম জন্মবর্ষে কিছুটা চর্চিতচর্যা করলাম।

উৎস ঃ আত্মচরিত (প্রফুল্লচন্দ্র রায়), Birrth Centenery volume (c.u.) ছোটোদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—খগেন্দ্রনাথ মিত্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা—রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, আসা যাওয়ার মাঝখানে নলিনীকান্ত সরকার, রবীন্দ্র রচনাবলী (১৮ খণ্ড) বিশ্বভারতী, আনন্দবাজার, প্রতিদিন, একদিন এবং সর্বস্ব সহায়তায় শ্রী শংকর বাগ (প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক বজবজ পাবলিক লাইব্রেরি)